১০

ফলিত গবেষণা এবং নৃবিজ্ঞান
Applied Research and Anthropology

বর্তমান ইউনিটটি এই বইয়ের সর্বশেষ ইউনিট। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ফলিত নৃবিজ্ঞান কথাটি ব্যাপকভাবে আলোচিত। ফলিত গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নৃবিজ্ঞানকে সংক্ষেপে ফলিত নৃবিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এর পাশাপাশি আরও কিছু শব্দমালা শোনা যায়। অন্যান্য শাস্ত্রের সাথে মিলে নৃবিজ্ঞানীরা পলিসি গবেষণা কিংবা এ্যাকশন গবেষণা করে থাকেন। এই ধারণাগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সাধারণভাবে যে সকল সংস্থা বিভিন্ন উন্নয়ন গবেষণা করে থাকে এই শব্দগুলো তারাই প্রথম ব্যবহার করেছে। এই মুহূর্তে নৃবিজ্ঞানের আলোচনায় এগুলো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক আলোচনা হলেও এই বিষয়ে বিতর্ক, আলোচনা অন্তত ৭০-৮০ বছরের পুরোনো। মূল বিতর্কের জায়গা হচ্ছে প্রশাসনের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক কি হবে। প্রাথমিক কালে আলোচনার কেন্দ্রে ছিল ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক। কারণ তখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সে সকল অঞ্চলে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসকদের শাসন-নীতিমালা কি হবে তা নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা বজায় ছিল। বর্তমান কালের ফলিত নৃবিজ্ঞানের প্রবক্তাগণ মনে করেন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের নীতিমালা প্রণয়নে নৃবিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা থাকতে পারে। ইউনিটের প্রথম ২টি পাঠে এই সংক্রান্ত আলোচনার পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে। শেষ পাঠটিতে আলোচনা হয়েছে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পলিসি-গবেষণায় নৃবিজ্ঞানের অংশগ্রহণ বিষয়ে। সাধারণভাবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ফলিত নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক থাকলেও সেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কতকগুলি খাতে বিভক্ত। স্বাস্থ্য তার মধ্যে অন্যতম। কোন কোন নৃবিজ্ঞানীর মতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিমণ্ডলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের (medical anthropology) মত ব্যাপক পরিচিত শাখার জন্ম হয়েছে।

.

- পাঠ - ১ : ফলিত গবেষণায় নৃবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি
- পাঠ - ২ : উন্নয়ন ভাবনা এবং তৃতীয় বিশ্বে গবেষণা
- পাঠ - ৩ : স্বাস্থ্য ভাবনা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান

পাঠ - ১

ফলিত গবেষণায় নৃবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি
Incorporating Anthropology into Applied Research

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- ফলিত গবেষণার প্রেক্ষাপট
- ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোতে নৃবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে ম্যালিনোস্কির ভাবনা ও যুক্তি
- জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিষয়ে পরামর্শ দেবার ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক অবস্থান

সাধারণভাবে যে সকল গবেষণার উদ্দেশ্য থাকে কোনও সুপারিশমালা গ্রহণ কিংবা কোনও সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব করা সেগুলিকে ফলিত গবেষণা বলা হয়ে থাকে।

গত কয়েক দশক ধরে নৃবিজ্ঞানে 'ফলিত নৃবিজ্ঞান' (applied anthropology) কথাটি ব্যাপক প্রচলিত। এতে বোঝানো হয়ে থাকে ফলিত গবেষণার জগতে নৃবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণকে। কিন্তু ফলিত গবেষণা (applied research) বলতেই বা আমরা কি বুঝব? এখানে আর কয়েকটা শব্দ আমরা স্মরণ করতে পারি। এই শব্দগুলো ফলিত গবেষণার সমার্থক বা কাছাকাছি অর্থে বোঝানো হয়ে থাকে। সেগুলো হচ্ছে এ্যাকশন গবেষণা (action research) এবং পলিসি গবেষণা (policy research)। এই নামগুলো থেকে একটা ধারণা পাওয়া সম্ভব হয় যে ফলিত গবেষণা বলতে আসলে কি বোঝানো হয়ে থাকে। সাধারণভাবে যে সকল গবেষণার উদ্দেশ্য থাকে কোনও সুপারিশমালা গ্রহণ কিংবা কোনও সমস্যার সমাধানের প্রস্তাব করা সেগুলিকে ফলিত গবেষণা বলা হয়ে থাকে। আর ফলিত গবেষণায় নৃবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণকে সংক্ষেপে ফলিত নৃবিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে ফলিত নৃবিজ্ঞান কথাটি গত কয়েক বছর ধরে প্রচলিত থাকলেও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এই শব্দটি ২/৩ দশক ধরে ব্যাপক চালু আছে। কিন্তু শব্দটি জনপ্রিয় হবার আগে থেকেই এই ধারার গবেষণায় নৃবিজ্ঞানের অংশগ্রহণ রয়েছে। বিশেষভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন শাস্ত্রের কিছু পণ্ডিত ও গবেষক নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন এমন ধরনের গবেষণায় যেখান থেকে কোনও না কোনও সুপারিশ গৃহীত হয়ে থাকে। এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। সুপারিশ কিংবা প্রস্তাব গ্রহণ করা প্রশাসনিক কাঠামোর অঙ্গে বিজড়িত। তার মানে ফলিত নৃবিজ্ঞান বা ফলিত গবেষণার সঙ্গে প্রশাসনিক কাঠামোর একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে।

ম্যালিনোস্কির বক্তব্য

"দ্য র‍্যাশনালাইজেশন অব এ্যান্থ্রোপলজি এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন" (নৃবিজ্ঞানের যৌক্তিকতা-প্রমাণ এবং প্রশাসন) নামে একখানা প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসনকার্য চালাবার জন্য প্রশাসন নৃবিজ্ঞানীদের সহায়তা নিতে পারেন।

নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে তাকালে প্রশাসনের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্কের এই ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার হয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রশাসনের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানীদের পেশাগত সম্পর্ক কি হবে – সেটা নিয়ে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা এবং বিতর্ক চলছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণে নৃবিজ্ঞানীরা কিভাবে সাহায্য করতে পারে তা নিয়ে অনেক নৃবিজ্ঞানী নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ব্রনিস্‌লো ম্যালিনোস্কির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবিদার। তিনি ১৯৩০ সালে "দ্য র‍্যাশনালাইজেশন অব এ্যান্থ্রোপলজি এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন" (নৃবিজ্ঞানের যৌক্তিকতা-প্রমাণ এবং প্রশাসন) নামে একখানা প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তাঁর মূল বক্তব্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসনকার্য চালাবার জন্য প্রশাসন নৃবিজ্ঞানীদের সহায়তা নিতে পারেন।

ম্যালিনোস্কির বক্তব্য আলাদা গুরুত্ব দিয়ে পাঠ করবার প্রধান কারণ হচ্ছে নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর প্রভাব ব্যাপক। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে কতকগুলো প্রসঙ্গ তোলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গগুলোই ফলিত নৃবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করবার ভূমিকা রেখেছে। তাছাড়া ম্যালিনোস্কির তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ এই ধারাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। সেটাও এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিক। ম্যালিনোস্কির চিন্তাভাবনা ক্রিয়াবাদী হিসেবে

খ্যাত। তিনি সংস্কৃতিকে অনুধাবন করেছিলেন জৈবিক ক্রিয়া হিসেবে। একই সাথে নৃবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে তিনি কোনও সমাজে সংঘটিত ক্রিয়াদি পর্যবেক্ষণের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাঁর প্রস্তাবিত এই পদ্ধতি সমকালীন নৃবিজ্ঞানের কোনও কোনও মহলকে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আমরা আলোচনায় লক্ষ্য করব, এখন অব্দি পলিসি গবেষণাতে ক্রিয়াবাদী ধারাই মূলত প্রভাবশালী। এ ধরনের গবেষণায় এই তাত্ত্বিক ধারা সুবিধাজনক হিসেবে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া নৃবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে দাঁড় করাবার ক্ষেত্রে যে সকল নৃবিজ্ঞানী তৎপর হয়েছিলেন ম্যালিনোস্কি তাঁদের অন্যতম। এই সকল ভাবনা থেকেই ৭০ বছর আগে প্রকাশিত ম্যালিনোস্কির প্রবন্ধটির স্বতন্ত্র গুরুত্ব টের পাওয়া যায়।

ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামোতে নৃবিজ্ঞানের ভূমিকা

আপনারা জানেন যে, নৃবিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যে বিষয়টা এখানে মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে: সকল সময় এই সম্পর্কটা প্রত্যক্ষ নয়। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে পারে। ম্যালিনোস্কি যখন পলিনেশীয় এলাকাতে গবেষণা করতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপিত ছিল। কিন্তু ম্যালিনোস্কি কখনোই সে প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় আনেননি কিংবা এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেননি। পরবর্তী কালের অনেক নৃবিজ্ঞানী এই বিষয়টাকে সামনে নিয়ে এসেছেন। তাঁদের যুক্তি হচ্ছে: কোন নৃবিজ্ঞানী যদি প্রত্যক্ষভাবে কোন ঔপনিবেশিক শাসকের অধীনে চাকরি নাও করেন, যে ব্যবস্থার মধ্যে তাঁর মাঠকর্ম সাধিত হয়, যে অসম সম্পর্কের মধ্যে নৃবিজ্ঞানীর গবেষণা ক্ষেত্রের মানুষজন এবং নৃবিজ্ঞানীর 'নিজ' সমাজের মানুষজন বসবাস করেন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নিপীড়ন – এ সবই নৃবিজ্ঞানীর কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এগুলোকে বাদ দিয়ে নৃবিজ্ঞানীর গবেষণাকে বোঝা যাবে না।

কোন নৃবিজ্ঞানী যদি প্রত্যক্ষভাবে কোন ঔপনিবেশিক শাসকের অধীনে চাকরি নাও করেন, যে ব্যবস্থার মধ্যে তাঁর মাঠকর্ম সাধিত হয়, যে অসম সম্পর্কের মধ্যে নৃবিজ্ঞানীর গবেষণা ক্ষেত্রের মানুষজন এবং নৃবিজ্ঞানীর 'নিজ' সমাজের মানুষজন বসবাস করেন, ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ নিপীড়ন – এ সবই নৃবিজ্ঞানীর কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে ম্যালিনোস্কি সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনে নৃবিজ্ঞানীদের সহযোগিতার কথা বলেন। কেবল তাই নয়, যে সকল নৃবিজ্ঞানীরা এই কাজে সহায়তা করবার প্রচেষ্টা নেননি, ম্যালিনোস্কি তাঁদের তিরস্কারও করেন। এক্ষেত্রে তিনি অন্যান্য জ্ঞানকাণ্ড এবং প্রশিক্ষণ থেকে আসা বিশেষজ্ঞদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। ম্যালিনোস্কির ভাষায়:

> "...বিগত একটা প্রবন্ধে (*আফ্রিকা*, জানুয়ারী ১৯২৯) আমি দেখাবার চেষ্টা করেছি যে আমাদের বর্তমান-কালের বিদ্যাজাগতিক নৃবিজ্ঞান এখন অবধি ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণকে সহায়তা দান করবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেনি। একই সঙ্গে আমি দেখিয়েছি যে নতুন একটা পদ্ধতি এবং নতুন একটা তত্ত্ব, ক্রিয়াবাদী ধারা, খুব দ্রুত আকৃতি পেয়ে যাচ্ছে, এবং এটা, যদি ঔপনিবেশিক-ক্ষেত্রের লোকজনের সহযোগিতা লাভ করে, নিঃসন্দেহে পলিসি বানানোতে একই ভূমিকা নিতে পারবে প্রকৌশলের ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞান এবং ভূতত্ত্ববিজ্ঞান যা করেছে।..."
>
> [ম্যালিনোস্কি, ১৯৩০: পৃ. ৪০৮]

এই অংশটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়লে ফলিত নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় অনেকগুলো বিষয় পরিষ্কার হওয়া সম্ভব। এখানে ধরে নেয়া হয়েছে যে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ইউরোপীয় শাসকদের উপনিবেশ স্থাপন স্বাভাবিক। এবং এই উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় শাসকদের সহযোগিতা প্রদান করাই নৃবিজ্ঞানীদের মুখ্য কাজ, তাঁদের পেশাগত সমৃদ্ধির বিষয়টাও এখানে যুক্ত। বিশ্ব জুড়ে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি নৃবিজ্ঞানীদের কারো কারো পক্ষপাত ভেবে দেখার মত। ইউরোপের সভ্যতা সংক্রান্ত ভাবনা এখানে প্রাসঙ্গিক। সারা দুনিয়াতে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তারা যে যুক্তি দেখিয়েছে তা হ'ল: সভ্যতা আনয়ন। তাদের দাবি ছিল সারা দুনিয়াতে তারা সভ্যতা বয়ে নিয়ে এসেছে। ম্যালিনোস্কির মত অনেক নৃবিজ্ঞানীই এই ভাবনাকে সমর্থন করে গেছেন। আমরা পরবর্তী পাঠে দেখতে পাব কিভাবে পরবর্তী কালের নৃবিজ্ঞানে একই বিষয় কিংবা একই ভাবনা কাজ করেছে। সেখানে মূল প্রতিপাদ্য সভ্যতা আনয়ন নয়, উন্নয়ন। উদ্ধৃত বক্তব্যের একটু পরেই ম্যালিনোস্কি নাইজেরিয়ার একজন গভর্নরের বরাত দিয়ে জানান যে তাঁর এই বক্তব্য প্রশাসনের সমর্থনও পাচ্ছে।

> "...আমার প্রবন্ধ দুটো প্রত্যুত্তরে উৎসাহ যুগিয়েছে, দুটোই খুব কাজের। তার একটাতে বিশাল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন প্রশাসক, মেজর রাক্সটন, এক কালে নাইজেরিয়ার দক্ষিণের প্রদেশগুলোর লেফটেন্যান্ট-গভর্নর ছিলেন, আমার দৃষ্টিকোণ প্রায় নিরঙ্কুশভাবে মেনে নিয়েছেন, এবং নিজের অভিজ্ঞতা হতে দেখিয়েছেন কিভাবে ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানী এবং প্রশাসকদের মধ্যকার সহযোগিতা সত্যকার ফলপ্রসূভাবে গড়ে তোলা যেতে পারে।..."
>
> [ম্যালিনোস্কি, ১৯৩০: পৃ. ৪০৮]

বোঝাই যায় যে, নাইজেরিয়ার এই সাবেক প্রশাসক আসলে ব্রিটিশ প্রশাসনের কেউ এবং ম্যালিনোস্কি নৃবিজ্ঞানীদের সম্ভাব্য ভূমিকা ও পেশা দাঁড় করাবার জন্য সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছেন। এই প্রচেষ্টা থেকেই আমরা ফলিত নৃবিজ্ঞানের গড়ে ওঠা অনুমান করতে পারব। উদ্ধৃত অংশে আরও একটি জায়গা মনোযোগ পাবার দাবিদার। ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানীদের প্রসঙ্গ সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও ম্যালিনোস্কির ভাবনায় নৃবিজ্ঞানকে একটি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হিসেবে প্রমাণ করবার তাগিদ রয়েছে।

বিজ্ঞানের শাস্ত্র হিসেবে নৃবিজ্ঞান

ম্যালিনোস্কি যে সময়ে আলোচ্য প্রবন্ধখানি লেখেন সেই সময়ে জ্ঞানকাণ্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞান নিয়ে একটা বিশেষ বিতর্ক চলছিল। তা হচ্ছে, নৃবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা কিংবা কিভাবে নৃবিজ্ঞান একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান হয়ে উঠতে পারে। ম্যালিনোস্কি নিজে একে বিজ্ঞান হিসেবে দেখতে চাইতেন। প্রথম উদ্ধৃতিতে লক্ষ্য করা যায়, তিনি ঔপনিবেশিক শাসকদের সহযোগিতা করবার জন্য নৃবিজ্ঞানীদের সম্ভাব্য দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে বলতে গিয়ে পদার্থবিজ্ঞান এবং ভূতত্ত্ববিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কেবল ওইটুকুই নয়। তাঁর ভাবনার আগাগোড়ায় এই তাগিদ ছিল। এবং তিনি অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও সমালোচনা করেছেন যে সকল শাস্ত্র, তাঁর মতে, যথেষ্ট কাজে আসেনি।

> *"..সংক্ষেপে, আমি নৃবিজ্ঞানকে একটা সত্যকার বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি এবং অনিবার্যভাবে বিজ্ঞান যে সকল প্রপঞ্চ নাড়াচাড়া করে সেগুলোর মধ্যে তার সামঞ্জস্যবিধান এবং যৌক্তিকতাবিধান করতে হবে।..."*
> *– ম্যালিনোস্কি*

> "...এবং এখন, কুড়ি বছর ধরে নৃবৈজ্ঞনিক কাজ করবার পর, আমি নিজেকে দেখতে পাই, বিরক্তিসমেত, মানুষের একটা কর্মসংঘ হিসেবে মানুষের বিজ্ঞানটাকে ততটাই খারাপ আর বিমানবিককারী হিসেবে তৈরি করতে প্রচেষ্ট আছি যতটা পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা কিংবা জীববিজ্ঞান করে এসেছে গত শতক ধরে কিংবা প্রকৃতির প্রতি বিপ্রাকৃতিককারী হিসেবে। সংক্ষেপে, আমি নৃবিজ্ঞানকে একটা সত্যকার বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে তুলবার চেষ্টা করছি এবং অনিবার্যভাবে বিজ্ঞান যে সকল প্রপঞ্চ নাড়াচাড়া করে সেগুলোর মধ্যে তার সামঞ্জস্যবিধান এবং যৌক্তিকতাবিধান করতে হবে।..."
>
> [ম্যালিনোস্কি, ১৯৩০: পৃ. ৪০৬]

এই উদ্ধৃতি থেকে কিছু বিষয় পরিষ্কার হয়। এর পরে যদিও তিনি বিজ্ঞান নিয়ে সতর্কতা প্রকাশ করেছেন কিন্তু একই সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের বিজ্ঞান হয়ে ওঠাকে অনিবার্য হিসেবে দেখেছেন। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ম্যালিনোস্কি যখন কাজ করছেন তখন লেখাপড়ার জগতে ব্রিটেন বা অন্যান্য ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক বিজ্ঞান দাঁড়ায়নি। ফলে বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর এই আগ্রহের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি সত্যকার বিজ্ঞানের কথা বারবার জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁর ভাবনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে তিনি সত্যকার বিজ্ঞান বলতে বুঝিয়েছেন যার প্রয়োজন আছে, যা প্রায়োগিক। বর্তমান বিশ্বের নৃবিজ্ঞানে যে সকল বিতর্ক চালু আছে, সেখানেও এই যুক্তিটা খুবই প্রচলিত। এমনকি নৃবিজ্ঞানের বাইরেও এই যুক্তিটা জোরেসোরে শোনা যায়। প্রয়োজনীয়তা কিংবা প্রায়োগিকতার প্রসঙ্গ ফলিত নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ফলিত নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে যে সকল নৃবিজ্ঞানীর নাম জড়িত তাঁদের অনেকেরই যুক্তি হচ্ছে: ফলিত নৃবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক আছে, এর প্রয়োজন আছে। এর পাশাপাশি এই যুক্তিটাও চলে আসে যে 'বিশুদ্ধ' বিজ্ঞান সবসময়েই প্রায়োগিক, এর প্রয়োজনীয়তা আছে। আবার যে সকল নৃবিজ্ঞানী এই ব্যাপারে যথেষ্ট সমালোচনা করেন তাঁদের যুক্তি হচ্ছে: ফলিত নৃবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা আসলে কিছু সংস্থার প্রয়োজনীয়তা, পলিসি নির্ধারণের প্রয়োজনে নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান ব্যবহার করে তারা।

ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক ধারার সঙ্গে ফলিত নৃবিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

আপনারা জানেন যে ম্যালিনোস্কি ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানী ছিলেন। এই পাঠের গোড়াতেও সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক ধারার সঙ্গে ফলিত নৃবিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ম্যালিনোস্কি ধারাবাহিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানীদের উপর। তাঁর মতে, প্রশাসনকে সহযোগিতা করবার জন্য ক্রিয়াবাদী নৃবিজ্ঞানীরাই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি অপরাপর ধারার নৃবিজ্ঞানীদের সমালোচনা করেছেন। এখানে মনে রাখা আবশ্যক ম্যালিনোস্কি যে সময়কালে কাজ করেছেন তখন নৃবিজ্ঞানে অপর ধারা বলতে মূলত বিবর্তনবাদ বোঝাত। নানারকম ভিন্নতা সত্ত্বেও নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে এই ধারার ব্যাপক প্রভাব ছিল – তা বলা যায়। ম্যালিনোস্কি এই ধারাকে নানা কারণে সমালোচনা করেছেন। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন অতীত কালের মানুষের তুলনায় বর্তমান কালের মানুষের জীবন নৃবিজ্ঞানীদের প্রধান আগ্রহ হওয়া উচিত। তিনি অন্যান্য ধারার অপ্রয়োজনীয়তা বোঝাতে তাকে 'রোমান্টিক' বলেন। তাহলে ক্রিয়াবাদের মূল পরিচয় কি? ম্যালিনোস্কির ভাষায়:

> "...একেবারে সরলতম নীতিমালার দিক থেকে দেখলে, ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সহজভাবে বোঝায় যে কোনও একটি প্রপঞ্চ নিয়ে আলোচনা করবার জন্য তাকে সেভাবেই বুঝতে হবে ঠিক যেভাবে সেটা আছে; উদাহরণ হিসেবে, বিয়ের উৎপত্তি খুঁজতে গেলে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এবং নানা রকমফেরের মধ্যে বিয়ে আসলে কী তা জানতেই হবে; কোনও প্রথা, প্রতিষ্ঠান, কিংবা এমনকি কোনও একটা প্রয়োগ-হাতিয়ার অধ্যয়ন করতে চাইলে, এটা অবশ্যই ভালভাবে বুঝতে হবে যে সংস্কৃতির এই এককটি সমগ্র সংস্কৃতি প্রকল্পের মধ্যে কোন অংশটি পালন করে।..."
>
> [ম্যালিনোস্কি, ১৯৩০: পৃ. ৪০৯]

উদ্ধৃত অংশটি ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বুঝবার জন্য সহায়ক। বর্তমান নৃবিজ্ঞানের মুখ্য ধারা কোনমতেই বিবর্তনবাদ নয়। তাই বিবর্তনবাদকে বিরোধিতা করবার প্রশ্ন আসছে না। কিন্তু ক্রিয়াবাদী ধারার গবেষণা বর্তমান কালের অন্যান্য তাত্ত্বিক ধারার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে – তা নিশ্চিত করে বলা যায়। ফলিত গবেষণায় ক্রিয়াবাদী ধারার চিন্তাভাবনা ব্যাপক জনপ্রিয়। যে সকল সংস্থা এই ধরনের গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে তাদের বক্তব্য হচ্ছে তারা বাস্তবানুগ গবেষণা করাতে চায়। এর একটা মানে দাঁড়িয়েছে: গবেষিত মানুষজন যা ভাবছেন। ফলিত গবেষণার বর্তমান ধারাতে বিভিন্ন রকম পলিসি বা নীতিমালা গ্রহণের জন্য কোন অঞ্চলের মানুষের ভাবনা জানবার চেষ্টা করা হয়। ফলে আগে পরে অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে বর্তমানকে সামনে নিয়ে আসা হয়। ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক ধারা এই ব্যাপারে একটা গোড়াপত্তন করে রেখেছে। ফলিত গবেষণায় বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নৃবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ বড় মাপের বিতর্ক তৈরি করেছে যা আগামী পাঠে উল্লেখ করা হবে।

সারাংশ

ফলিত নৃবিজ্ঞান বলতে বোঝায় ফলিত গবেষণায় নৃবৈজ্ঞানিক অংশগ্রহণ। ফলিত গবেষণা বলতে বোঝায় যে সকল গবেষণা থেকে কোনও নীতিমালা বা সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। সে হিসেবে এর অন্য নাম পলিসি রিসার্চ। ফলিত নৃবিজ্ঞান কথাটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত সাম্প্রতিককালে। কিন্তু প্রশাসনিক নীতিমালা গ্রহণে নৃবিজ্ঞানীদের অংশ নেয়ার নমুনা নৃবিজ্ঞানের প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই আছে। এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ম্যালিনোস্কির বক্তব্য। তাছাড়া তাঁর প্রদর্শিত ক্রিয়াবাদী ধারা ফলিত নৃবিজ্ঞানের চিন্তাপদ্ধতি হিসেবে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। বর্তমান বিশ্বের নৃবিজ্ঞানে ফলিত ধারার গবেষণা মুখ্যত ক্রিয়াবাদী ধারাতেই পরিচালিত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। ম্যালিনোস্কির চিন্তাভাবনা ---------- হিসেবে খ্যাত।

ক. বিবর্তনবাদী　　খ. কাঠামোবাদী
গ. নারীবাদী　　ঘ. ক্রিয়াবাদী

২। ম্যালিনোস্কি যখন পলিনেশীয় এলাকাতে গবেষণা করতে গিয়েছিলেন তখন সেখানে কাদের উপনিবেশ স্থাপিত ছিল ?

ক. ডাচ　　খ. পুর্তুগীজ
গ. বৃটিশ　　ঘ. স্পেনীশ

৩। ---------- তাত্ত্বিক ধারার সাথে ফলিত নৃবিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

ক. ক্রিয়াবাদী　　খ. বিবর্তনবাদী
গ. কাঠামোবাদী　　ঘ. নারীবাদী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফলিত গবেষণা বলতে আপনি কী বোঝেন?
২। ক্রিয়াবাদ কাকে বলে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রশাসনিক কাজকর্মে নৃবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে ম্যালিনোস্কির মূল বক্তব্য কী?
২। ঔপনিবেশিক স্বার্থের সঙ্গে ফলিত নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

পাঠ - ২

উন্নয়ন ভাবনা এবং তৃতীয় বিশ্বে গবেষণা
Development Thought and Research in the Third World

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- ফলিত গবেষণা বলতে বর্তমানে কি বোঝানো হয়ে থাকে
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতিতে উন্নয়নের ধারণা
- উন্নয়নের সঙ্গে ফলিত গবেষণার সম্পর্ক

আগের পাঠ থেকে আপনারা জানেন কোন্ ধরনের প্রেক্ষাপট থেকে নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডে ফলিত গবেষণার একটা নিবিড় যোগাযোগ তৈরি হয়। এখানে সারাংশ আকারে বলা যায়, বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক নীতিমালা প্রণয়নে নৃবিজ্ঞানীদের অংশ নেবার প্রক্রিয়াই ফলিত নৃবিজ্ঞান ধারার সূচনা করে, এবং গোড়াতে নৃবিজ্ঞানীদের এই সম্পর্ক ছিল ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই প্রক্রিয়াটাতে উল্লেখযোগ্য বদল আসে। সেই প্রেক্ষিতে ফলিত নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাবনা-চিন্তার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, এবং পদ্ধতিতেও। এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ভাবনার জায়গা হয়ে দাঁড়াল 'উন্নয়ন'। আলোচনার সুবিধার্থে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে সামান্য আলোকপাত করা জরুরী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর নতুন পরিস্থিতিতে স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর সঙ্গে সাবেক ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্পর্ক কি হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা দেখা দিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর পরিচালকদের মাথায়।

আপনারা জানেন যে একটা সময় ইউরোপের বাইরের সারা দুনিয়ায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্য দখল বসিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই সারা দুনিয়ার নিপীড়িত জাতিসমূহ ইউরোপীয় উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। এই লড়াইগুলো আগেও ছিল। তবে নানান অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এগুলো হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে সেগুলো উপনিবেশের বিরুদ্ধে জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই সকল আন্দোলন ঔপনিবেশিক শক্তিকে হঠিয়ে দেবার ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য লাভ করতে থাকে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের মানুষজন স্বাধীনতা লাভ করেন। এই প্রক্রিয়ায় অনেকগুলো জাতিরাষ্ট্র গঠিত হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে: যে সকল রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছে তার সবগুলোই একসময়ে ঔপনিবেশিক শক্তির অধীনস্ত ছিল। নতুন পরিস্থিতিতে স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর সঙ্গে সাবেক ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্পর্ক কি হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা দেখা দিল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর পরিচালকদের মাথায়। একই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই পরিকল্পনায় শরিক হয়ে উঠল। এটাও আমাদের খেয়াল রাখা দরকার যে, আফ্রিকা এবং আফ্রিকা মহাদেশের বাইরে অনেকগুলো দেশ স্বাধীন হবার পরও সেখানকার শাসকরা মূলত ইউরোপের থেকে গেল। যে সকল দেশে দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের মধ্যে শাসক দেশ থেকে প্রচুর সংখ্যক লোকজন এসে জায়গা-জমি দখল করে নিতে থাকল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারাই সেইসব দেশের শাসক হয়ে বসল। জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকা ইত্যাদি রাষ্ট্রের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

উন্নয়নের...ধারণার মুখ্য দিক হচ্ছে নতুন জাতিসমূহের 'সংকট' চিহ্নিত করা।

এই সময়কালে শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে 'উন্নয়ন' ধারণাটি আসে। নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন, তারা যথেষ্ট পিছিয়ে আছে – এই প্রচারণাটি উন্নয়নের ধারণার ভিত শক্ত করতে সাহায্য করে। উন্নয়ন ধারণাটিকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া এবং উপনিবেশোত্তর (যে সকল সমাজে উপনিবেশ ছিল) সমাজের জন্য সেটাকে আবশ্যিক গ্রহণযোগ্য করে তোলার নিরন্তর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই প্রচারণা উদ্যোগ সফল হয়েছিল। ইতিহাসেই তার প্রমাণ মেলে। এ জন্যেই 'উন্নয়ন'কে

অনেকে বৈশ্বিক প্রকল্প বলে মনে করেন। অনেক চিন্তাবিদ বিশ্বজুড়ে এই উন্নয়ন প্রকল্পকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে, এটা হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসকদের যুদ্ধের পরবর্তী সময়কালের পরিকল্পনা। এর মানে হ'ল: যেহেতু যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নানান কারণে উপনিবেশের প্রত্যক্ষ শাসন হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, তাই নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবার নতুন পরিকল্পনা তাদের জন্য দরকার হয়ে পড়ল। সেই পরিকল্পনার ফসল হচ্ছে উন্নয়নের ধারণা। এই ধারণার মুখ্য দিক হচ্ছে নতুন জাতিসমূহের 'সংকট' চিহ্নিত করা। এই ধরনের চিন্তাবিদ্‌দের বক্তব্য হচ্ছে, উপনিবেশের সম্পর্ক মোচনের পথে কৌশলগতভাবে উন্নয়নের গল্প ফাঁদা হ'ল। তাতে সাবেক ঔপনিবেশিক আমলা এবং নতুন স্থির হতে না পারা জাতীয়তাবাদী শাসকদের জন্য ক্ষমতার একটা ছাড়পত্র তৈরি হ'ল। তবে বন্দোবস্তটা নিছক এখানেই থেমে থাকল না। বহুজাতিক কুলীন যারা, ধরা যাক বহুজাতিক বাণিজ্যসংস্থা, তারাও এর শরিক হতে পারল। প্রত্যেকেরই কাজ দাঁড়াল যেটা এরই মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে – নতুন জাতিরাষ্ট্রের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা। সেই এক পুরোনো কাহিনী। কিভাবে রাষ্ট্রসমূহ 'পশ্চাৎপদতা' থেকে 'আধুনিকতা'র দিকে যাত্রা করতে পারে। চিন্তাবিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ অনেকেই এ নিয়ে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে উন্নয়নের এই ধারণা ও আলাপ-আলোচনা কপট।

উন্নয়ন...প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে অনুদান এবং ঋণ আসতে শুরু করল। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক বড় বড় সব পদ তৈরি হ'ল।

উন্নয়ন নিয়ে এইসব আলাপ আলোচনার প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠল একটার পর একটা উন্নয়ন সংস্থা – প্রথমে আন্তর্জাতিক এবং আস্তে আস্তে দেশীয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যেই এসব ঘটতে শুরু করে দিয়েছিল। এর প্রভাব এবং ফলাফল নানামুখী হয়ে উঠল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে বিষয়টা আমাদের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে: এই প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে অনুদান এবং ঋণ আসতে শুরু করল। তাছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক বড় বড় সব পদ তৈরি হ'ল। সেই সকল পদে এমন বিশেষজ্ঞরা কাজ পেতে শুরু করলেন যাঁদের প্রশিক্ষণকে নতুন এই জাতিরাষ্ট্রগুলির বদলের জন্য জরুরী হিসেবে দেখানো হচ্ছিল, ভাবানো হচ্ছিল। বিশাল এই চক্রের মধ্যেই উন্নয়ন এবং নৃবিজ্ঞান কাছাকাছি আসতে পেরেছে। তার মানে, স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্রগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনায় নৃবিজ্ঞানীদেরও ডাক আসতে শুরু করল। আপনাদের মনে পড়বে ম্যালিনোস্কির বক্তব্য যেখানে বাস্তবানুগ নৃবিজ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। 'উন্নয়ন' ধারণার যুগে নৃবিজ্ঞানের বাস্তবানুগ হওয়া বলতে বোঝা হ'ল উন্নয়ন পরিকল্পনায় নৃবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ। আর এই পরিকল্পনা করে দিতে থাকল সাবেক ঔপনিবেশিক প্রভুরা।

নৃবিজ্ঞানে 'উন্নয়ন'-এর দুই প্রকার ধারণা

এখানে প্রাসঙ্গিক একটা বিষয়ে কিছু আলাপ করা হবে। নৃবিজ্ঞানের জগতে উন্নয়ন ধারণাটির অর্থ নিয়ে এই আলাপ। পশ্চিমা সমাজের দর্শন এবং সংস্কৃতিতে উন্নয়ন ধারণাটি একেবারে কেন্দ্রীয়। নৃবিজ্ঞান শাস্ত্রে এর অর্থ দুইভাবে দেখা দিয়েছে। একটি অপেক্ষাকৃত পুরোনো কালের নৃবিজ্ঞানের বিষয় এবং তুলনামূলকভাবে বড় প্রেক্ষাপটে তার অর্থ নির্দিষ্ট ছিল। অন্যটি সেই তুলনায় সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানের বিষয় এবং আরও নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে এর অর্থ ক্রিয়াশীল।

উন্নয়নের প্রথম ধারণাটি উনবিংশ শতকের নৃবিজ্ঞানের বিবর্তনবাদী চিন্তার একেবারে কেন্দ্রীয় ধারণা।

উন্নয়নের প্রথম ধারণাটি উনবিংশ শতকের নৃবিজ্ঞানের বিবর্তনবাদী চিন্তার একেবারে কেন্দ্রীয় ধারণা। এখানে সমগ্র মানবসমাজের ইতিহাসকে দেখা হ'ত সোজাসুজিভাবে। ধারণা করা হ'ত যে, মানুষ 'বন্যতা' এবং 'বর্বরতা'র ধাপ ডিঙিয়ে সামাজিক বিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে 'সভ্যতা'র দশায় উপনীত হয়। এই যাত্রাকে তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রগতি (progress) বলা হয়েছে। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, সভ্যতার এই ধারণা বানানো হয়েছিল পশ্চিমের সমাজ মাথায় রেখে। অর্থাৎ, পশ্চিমা সমাজই সভ্য – এই ধারণা থেকেই বিবর্তনের ধাপ ও চিন্তামালা গড়ে উঠেছে। বিবর্তনবাদী চিন্তার এই উন্নয়নকে বাংলা লেখালেখিতে 'বিকাশ' হিসেবে পরিচয় করানো হয়েছে। আবার, বাংলায় বিকাশ ও প্রগতি দুটো শব্দই ইংরেজি 'প্রোগ্রেস' শব্দটির অর্থানুবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যাই হোক, উন্নয়ন সংক্রান্ত উনিশ শতকের নৃবিজ্ঞানের এই ধারণা খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল – সেটা মনে রাখা জরুরী।

নৃবিজ্ঞানে উন্নয়নের সাম্প্রতিক ধারণাটি আপনারা ইতোমধ্যেই জেনেছেন। বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এই ধারণাটি গড়ে ওঠে। বিশেষ এই ধারণাতে উন্নয়নকে মূলত আর্থনীতিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে দেখা হয়। এক্ষেত্রে মুখ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত বিষয়গুলো হচ্ছে: উৎপাদন বাড়ানো, ভোগ বাড়ানো, এবং জীবন যাপনের মান বাড়ানো। মূলত গরিব বিশ্বের সমাজের জন্য এই লক্ষ্যগুলো ধার্য করা হয়েছে। এটাও এখানে স্মরণে রাখা দরকার যে, জীবন যাপনের মান বাড়ানো বলতে সাধারণ ভাবে ভোগ বৃদ্ধিকেই বোঝানো হয়ে থাকে। সমাজের মানুষের মধ্যে বৈষম্য বা ফারাক নিয়ে তেমন একটা ভাবনা-চিন্তা করবার রেওয়াজ এই চিন্তাধারাতে নেই। গত দু' দশকে দারিদ্র্য বিমোচন করবার একটা উদ্যোগ উন্নয়ন পরিকল্পনাতে নেয়া হয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে সেটাও উন্নয়ন ধারণার মত কপট। তাঁদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় গরিব বিশ্বের সমাজগুলোর বাস্তবতা দেখে। নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকাণ্ডের ইতিহাসে উন্নয়ন সংক্রান্ত যে দুই প্রকার ভাবনা পাওয়া যায় তাকে আলাদা আলাদা করে দেখে থাকেন কেউ কেউ। কিন্তু নৃবিজ্ঞানে উন্নয়ন ধারণা কাজ করেছে কিভাবে – তার হদিস নিতে গেলে এই দুই প্রকারের ভাবনাকে একত্রেই বুঝতে হবে। তাছাড়া ফলিত নৃবিজ্ঞানের গড়ে ওঠার সাথে এই দুই ভাবনারই নিবিড় যোগাযোগ আছে। কারণ, নৃবিজ্ঞানের প্রথম জমানায় 'সভ্যতা'র ধারণা নৃবিজ্ঞানীদেরকে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত করেছে; আর পরের জমানায় 'সমৃদ্ধি'র ধারণা নৃবিজ্ঞানীদেরকে আন্তর্জাতিক ক্ষমতা-নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করেছে। দুটো ধারণাই উন্নয়নের ধারণা। তবে প্রাসঙ্গিক বিষয় হচ্ছে, বর্তমানের সম্পর্কটা ফলিত নৃবিজ্ঞানের পরিচয়ে কাজ করছে।

উন্নয়ন গবেষণায় নৃবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ

সাধারণভাবে আপনারা জেনেছেন যে, ইউরোপ ও মার্কিনের নৃবিজ্ঞানীরা উন্নয়ন পরিকল্পনায় ও গবেষণায় যুক্ত আছেন। আর তাঁদেরকে সংক্ষেপে ফলিত নৃবিজ্ঞানী বলা হয়। কিন্তু এই ধারাটি বিশেষভাবে বেড়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নৃবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণের পয়লা শর্ত এবং বৈশিষ্ট্য হ'ল তাঁরা গরিব বা তৃতীয় বিশ্বের জন্য উন্নয়ন-পরিকল্পনার আবশ্যিকতা মেনে নেন। এই নৃবিজ্ঞানীরা প্রধানত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কাঠামোকে মঙ্গলময় হিসেবে দেখে নিয়ে এগিয়েছেন যা তাঁদের প্রতি সমালোচকদের সমালোচনার একটা বড় জায়গা। উন্নয়ন-নৃবিজ্ঞানীদের তৎপরতার মুখ্য দিক হ'ল: বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্বকে বাড়তে না দেয়া – যেমন, ধনী এবং গরিবদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব; বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রশমিত করা; শিল্পোন্নত এবং গরিব দেশগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনে চেষ্টা করা।

*ফলিত নৃবিজ্ঞানের সবচেয়ে উলে- খযোগ্য নিরীক্ষা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত পেরুর **ভিকোস** প্রকল্প।*

ফলিত নৃবিজ্ঞানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত পেরুর **ভিকোস** প্রকল্প। এখানে নৃবিজ্ঞানীদের বড় একটি দল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মুরুব্বী হয়ে পড়েন। তাঁরা ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি চালান। এর সমালোচনা করা হয় এই বলে যে, এর মাধ্যমে চূড়ান্ত বিচারে উৎপাদকদের (মালিক) ক্ষমতা চালান দেয়া হয়েছে। ফলিত নৃবিজ্ঞানীদের এই বৈশিষ্ট্যটা আলোচনায় আসা খুবই প্রয়োজন। পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত ফলিত নৃবিজ্ঞানীদের কাজের এই বৈশিষ্ট্যটি চিহ্নিত করা হচ্ছে যে, তাঁরা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং পরিষেবা সরবরাহ করবার একচেটিয়া কর্তৃত্ব উৎপাদনকারী গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে সাহায্য করে থাকেন। বাংলাদেশের পানীয় জল সংক্রান্ত আলোচনায়ও এরকম বিশ্লেষণ দেখা দিচ্ছে। ফলিত নৃবিজ্ঞানীরা একাধারে পানীয় জলের সমস্যার কথা বলে একটা সময়ে দেশীয় পানির ব্যবস্থা (ইঁদারা, খাসপুকুর, কূয়া) বিলোপ করেছেন। আবার, আর্সেনিক সমস্যার প্রাক্কালে বিশুদ্ধ পানির সংকটকে চিহ্নিত করে তাঁরা বোতলজাত পানির বিস্তারকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহায়তা দিচ্ছেন। মুস্কিল হ'ল: এখন তাঁরা দেশীয় পানির ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরলেও সেই ব্যবস্থায় পুনরায় ফিরে যাবার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

উন্নয়নের নানান ক্ষেত্র এবং ফলিত নৃবিজ্ঞানীর বিভিন্নতা

উন্নয়নের প্রচলিত ধারণা ক্রমশই বিস্তার লাভ করছে। গরিব বিশ্বের সরকারেরাও এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা রাখছেন। উন্নয়ন ধারণার এই বিস্তারের প্রেক্ষাপটে উন্নয়নের নানান দিক বা ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। সেটা করা হয়েছে উন্নয়ন-পরিকল্পনা নিতে যাতে সুবিধা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, শিক্ষা খাত, স্বাস্থ্য খাত, দারিদ্র্য খাত, পরিবেশ খাত ইত্যাদি। রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো খাতওয়ারী এরকম ভাগ করবার মধ্য দিয়ে গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যেও তার প্রভাব পড়েছে। পরিবেশ বিশেষজ্ঞ পরিবেশ সংক্রান্ত উন্নয়ন-পরিকল্পনার দায়িত্বই নেবেন, দারিদ্র্যের উন্নয়ন-পরিকল্পনা নেবেন না। এভাবে ফলিত নৃবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলেও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের জন্ম হয়েছে। এই অনুযায়ী নৃবিজ্ঞানীদের নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন, স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যে সকল নৃবিজ্ঞানী, কিংবা যাঁরা বর্তমানের স্বাস্থ্য-সংকটকে আবিষ্কার করেন তাঁদেরকে বলা হয় স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা নৃবিজ্ঞানী (medical anthropologist), কিংবা যাঁরা শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা করে থাকেন তাঁদেরকে বলা হয় শিক্ষা-নৃবিজ্ঞানী। কিন্তু সমন্বিতভাবে তাঁদেরকে উন্নয়ন-নৃবিজ্ঞানী বলা হয়ে থাকে। তবে এখানে মনে রাখা দরকার, উন্নয়নের গবেষণায় বিভিন্ন শাস্ত্রের মধ্যেকার ভিন্নতা আর তেমন ধরা পড়ে না – যেমন ধরা যাক, সমাজতত্ত্ব কিংবা নৃবিজ্ঞানের ভেদাভেদ।

ফলিত নৃবিজ্ঞানীরা এবং তাঁদের নিয়োগকর্তা সংস্থাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সমালোচনার মুখে এই ধারার গবেষণাকে রাজনৈতিক দিক থেকে আরও সংবেদনশীল করে তুলবার চেষ্টা করছেন।

এই পাঠের শেষ পর্যায়ে আমরা ফলিত নৃবিজ্ঞানের, কিংবা সাধারণভাবে উন্নয়ন নৃবিজ্ঞানের সমালোচনার মধ্য দিয়ে কিছু বদলের প্রসঙ্গে কথা বলব। দুটো স্পষ্ট বদলের কথা উল্লেখ করা জরুরী। *এক*, উন্নয়ন ধারার নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে একদল নৃবিজ্ঞানী নিজেদেরকে গড়ে তুলেছেন যাঁরা উন্নয়নের কপট ধারণা নিয়ে বিশ্লেষণ করে চলেছেন। তাঁদের প্রধান কাজ হচ্ছে, উন্নয়ন ধারণার ফাঁক-ফোঁকরগুলোকে চিহ্নিত করা, রাষ্ট্রীয়-আন্তর্জাতিক উন্নয়ন-পরিকল্পনার ক্ষয়-ক্ষতি বুঝিয়ে দেয়া এবং ক্ষমতার ফারাক আবিষ্কার করে দেয়া। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন, কেউ কেউ পুঁজিবাদ নিয়ে কাজ করছেন, কেউ কেউ আবার ঔপনিবেশিক ইতিহাস এবং বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে কাজ করছেন। *দুই*, ফলিত নৃবিজ্ঞানীরা এবং তাঁদের নিয়োগকর্তা সংস্থাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সমালোচনার মুখে এই ধারার গবেষণাকে রাজনৈতিক দিক থেকে আরও সংবেদনশীল করে তুলবার চেষ্টা করছেন। কোনও একটা উন্নয়ন প্রকল্পের সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি তাঁরা এখন নিজেরাও কিছু হিসেব করে দেখেন। তাছাড়া গবেষণা এলাকার মানুষজনের ভাবনাকেও সম্পর্কিত করা যায় কিভাবে – সে ধরনের উৎসাহ দেখা দিয়েছে। এসব প্রচেষ্টায় নৃবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি ও উপলব্ধিতে নানারকম বদল এসেছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান (medical anthropology/anthropology of health) এক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ। আগামী পাঠে ফলিত নৃবিজ্ঞানের একটা শাখা হিসেবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের কথা উল্লেখ করব।

সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন স্বাধীন হওয়া দেশগুলোর ব্যাপারে সাবেক ঔপনিবেশিক শাসকদের নীতিমালা নিয়ে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। উন্নয়ন নামক ধারণাটি নতুন রূপে দেখা দিল। এই ধারণার মুখ্য দিক হচ্ছে নতুন জাতিসমূহের 'সংকট' চিহ্নিত করা। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ধারাবাহিতকায় গরিব বিশ্বে অনুদান এবং ঋণ আসতে শুরু করল এবং বড় সব পদ তৈরি হ'ল। এসব পদে নৃবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ ফলিত নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্র উন্মোচন করেছে। ফলিত নৃবিজ্ঞান কি ধরনের বিপজ্জনক ভূমিকা রেখেছে তার সবচেয়ে ব্যবহৃত উদাহরণ হচ্ছে ***ভিকোস*** *প্রকল্প। ফলিত নৃবিজ্ঞানীরা এবং তাঁদের নিয়োগকর্তা সংস্থাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সমালোচনার মুখে এই ধারার গবেষণাকে রাজনৈতিক দিক থেকে আরও সংবেদনশীল করে তুলবার চেষ্টা করছেন।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। নৃবিজ্ঞানে উন্নয়নের সাম্প্রতিক ধারনাটি কখন গড়ে উঠে ?

ক. বিশ শতকের শুরুতে — খ. বিশ শতকের মধ্যভাগে

গ. বিশ শতকের শেষে — ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২। ফলিত নৃবিজ্ঞানের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা পেরুর ভিকোস প্রকল্পটি কে পরিচালনা করছে?

ক. অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় — খ. ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়

গ. হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় — ঘ. কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়

৩। উন্নয়ন নৃবিজ্ঞানীদের তৎপরতার মূখ্য দিক হলো,

ক. বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যকার দ্বন্দ্বকে বাড়তে না দেয়া

খ. বিভিন্ন সাংস্কৃতি মূল্যবোধের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে প্রশমিত করা

গ. শিল্পোন্নত ও গরীব দেশগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা

ঘ. উপরের সবগুলোই

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। উন্নয়ন গবেষণা কী?

২। নৃবিজ্ঞানে দুই প্রকারের উন্নয়ন ধারণা বলতে কী বোঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে গবেষণা জগতে আগ্রহের ক্ষেত্রে কী ধরনের বদল এসেছিল?

২। ফলিত নৃবিজ্ঞান আসলে উন্নয়ন ধারণার গবেষণায় নৃবিজ্ঞানের অংশগ্রহণ – ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ - ৩

স্বাস্থ্য ভাবনা এবং স্বাস্থ্যের নৃবিজ্ঞান
Health Perception and Medical Anthropology

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন :

- তৃতীয় বিশ্বের জনস্বাস্থ্যের প্রসঙ্গ কিভাবে গড়ে উঠল
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের পরিধি
- প্রচলিত স্বাস্থ্য-নীতিমালাকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানীদের চ্যালেঞ্জ

পটভূমি

জনসংখ্যাকে গরিব বিশ্বের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হ'ল। ফলে স্বাস্থ্য গবেষণার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা।

আপনারা আগের দুটো পাঠ থেকেই জানেন কিভাবে উন্নত বিশ্বের লেখাপড়ার জগতে গরিব বিশ্বের উন্নয়ন ধারণা গড়ে উঠেছে এবং সেখানে কি ধরনের বিতর্ক চলমান। উন্নয়ন ধারণাতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ভাবনা একেবারে কেন্দ্রীয় জায়গায় রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তৃতীয় বিশ্বের জনগণের স্বাস্থ্য বিষয়ে নানান আলাপ আলোচনা হতে থাকে। এই সব দেশের সরকারকে স্বাস্থ্য বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার জন্য চাপ দেয়া হয়। আপাত দৃষ্টিতে মহান এই পদক্ষেপের ব্যাপারে কতকগুলো প্রশ্ন তোলা জরুরী। সর্বপ্রথম যে ব্যাপারটা লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে, জনসংখ্যাকে গরিব বিশ্বের প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হ'ল। ফলে স্বাস্থ্য গবেষণার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে জনসংখ্যা বিষয়ক গবেষণা। এর পাশাপাশি কিছু রোগবালাই নিয়ে গবেষণা হতে থাকল। এখানেও লক্ষ্য করবার মত বিষয় হচ্ছে পরিচ্ছন্নতার ধারণা। অর্থাৎ, কিছু রোগকে গরিব বিশ্বের ক্ষেত্রে বাছাই করা হ'ল যেগুলোর মূল কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে পরিচ্ছন্নতার (hygienic) ধারণার অভাব। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উদরাময় বা পেটের ব্যামো, আফ্রিকার ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার কথা উল্লেখ করা যায়। পরিবেশের প্রসঙ্গও এসেছে, তবে এর সাথে পরিচ্ছন্নতার ধারণা সম্পর্কিত। রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পরিবেশের উপর শিল্প-কল-কারখানার আক্রমণাত্মক প্রভাব কিংবা দারিদ্র্যের মত বিমূর্ত বিষয়াদির তুলনায় ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার বোধ ও সচেতনতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বে অনেকগুলো স্বাস্থ্য গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক ভূমিকার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

এসকল গবেষণায় নৃবিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণ ছিল বিষয়গুলো আবিষ্কারের ক্ষেত্রে। এসকল বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা হবে এই পাঠে। তবে আরেকটি বিষয় না উল্লেখ করলেই নয়। তৃতীয় বিশ্বে অনেকগুলো স্বাস্থ্য গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক ভূমিকার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আইসিডিডিআর, বি - এর কথা। শুরুতে এর নাম অবশ্য ভিন্ন ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরী হয় সিয়াটো (SEATO : সাউথ ইষ্ট এশিয়ান ট্রিটি অর্গানাইজেশন)- এর প্রত্যক্ষ ভূমিকার মাধ্যমে। সিয়াটো একটি সামরিক জোট। এই বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে না চিন্তা করলে বাংলাদেশের মত একটা গরিব দেশের স্বাস্থ্যনীতি নিয়ে কি ধরনের তৎপরতা চলছে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। সৌভাগ্যের বিষয়, কিছু নৃবিজ্ঞানীই আবার আমাদের এ সকল বিষয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন। এই বিষয়গুলো নিয়ে গোড়াতেই আলাপ করে নেবার দরকার আছে। কারণ, অনেকেই মনে করেন যে মেডিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজি হচ্ছে আসলে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নৃবিজ্ঞান বা সংক্ষেপে স্বাস্থ্য-নৃবিজ্ঞান, সেটা বাংলা নামকরণ থেকেই আপনারা বুঝতে পারছেন। ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ধারণা কিভাবে ক্রিয়াশীল তা বোঝা জরুরী হয়ে ওঠে। এখানে দুয়েকটি বিষয়ে পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। *এক*, কোনও একটা রাষ্ট্র বা সমাজে জনস্বাস্থ্যের (public health) ধারণা কাজ করছে মানেই এই নয় যে সেখানে জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত আছে। কিংবা কোনও একটা সরকার জনস্বাস্থ্যের ঘোষণা দিচ্ছে মানেই এই নয় সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। *দুই*, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের কাজ কেবলমাত্র জনস্বাস্থ্য

প্রসঙ্গে নয়। এখানে জনস্বাস্থ্যের আলাপ এসেছে কারণ বিভিন্ন সমাজে – বিশেষত গরিব দেশগুলোর সমাজে – উন্নয়ন প্রসঙ্গে জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রীয় একটা বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে এবং এই সংক্রান্ত গবেষণা জরুরী হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলিত নৃবিজ্ঞানী হিসেবে স্বাস্থ্য-নৃবিজ্ঞানীরা (কোথাও কোথাও বাংলায় 'চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান' বলা হয়েছে) প্রাথমিকভাবে এই পটভূমিতেই তাঁদের কাজের বিস্তার ঘটিয়েছেন।

সংজ্ঞা এবং ইতিহাস

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের পরিধি এতটা ব্যাপক এবং এত নানাবিধ বিষয় এতে পঠিত হয়ে থাকে যে এর একটি একক সংজ্ঞা নির্ধারণ কঠিন। একদিকে অ-ইউরোপীয় সমাজের চিকিৎসা ব্যবস্থা বা ওষুধপাতি থেকে শুরু করে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির ভূমিকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের বিস্তৃতি। অন্যদিকে, বিভিন্ন সমাজের মানুষের স্বাস্থ্য ও অসুস্থতা সংক্রান্ত ভাবনা থেকে শুরু করে আধুনিক দর্শনে শরীর ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জ্ঞান কিভাবে তৈরি হয়ে চলেছে – তার সবই স্বাস্থ্য-নৃবিজ্ঞানের অন্তর্গত। কারো কারো গবেষণায় এসেছে গরিব শ্রেণীর উপর স্বাস্থ্যনীতির প্রভাব। এছাড়া স্বাস্থ্য-নৃবিজ্ঞানের বড় একটা এলাকা জুড়ে রয়েছে বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত গবেষণা ও পড়াশোনা। এক্ষেত্রে ধারণা করা হয় যে, বিভিন্ন সমাজ যেগুলো শিল্পভিত্তিক নয় – সেখানে নানান ধরনের বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান রোগবালাইয়ের সাথে সম্পর্কিত হয়ে আছে। সেই সমস্ত সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষকগণ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ কারণেই মেডিক্যাল এনথ্রপলজিকে অনেকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান বলে থাকেন যা ইতোমধ্যেই আপনারা জেনেছেন। কিন্তু সে আলোচনায় আমরা এখন যাব না। নামকরণ বিষয়ক সংকট নিয়ে পরে কিছু কথা বলার সুযোগ আছে।

সাধারণভাবে মেডিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজি বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান বলতে বোঝানো হয়ে থাকে স্বাস্থ্য, অসুস্থতা এবং ওষুধের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন। একাধারে একজন ডাক্তার এবং নৃবিজ্ঞানীকে এই শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা ভাবা হয়ে থাকে। তিনি হচ্ছেন ডবি- উ. এইচ. আর. রিভার্স। যদিও ওষুধ নিয়ে তিনি যে গবেষণাকর্ম করেছেন তার থেকেই খুব রাতারাতি নৃবিজ্ঞানের একটা উপশাখা দাঁড়ায়নি। রিভার্সের যুক্তি ছিল, 'আদিম ঔষধ'কে একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাঠ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সেই একই সূত্রাবলী এবং পদ্ধতিমালা প্রয়োগ করা যেতে পারে যা কিনা সমাজের অপরাপর প্রতিষ্ঠান অধ্যয়ন করার সময় নৃবিজ্ঞানীরা প্রয়োগ করে থাকেন। কিছু অনুশীলনের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ একটা সমগ্র হিসেবে 'আদিম ঔষধ'কে বিবেচনা করা হয়েছে এখানে। আর এই অনুশীলন গড়ে উঠেছে কোনও নির্দিষ্ট একটা সমাজের মানুষজনের মধ্যে রোগের কারণ সম্পর্কিত ধারণার উপর ভিত্তি করেই। আবার, রোগের কারণ সম্পর্কিত এই ধারণাবলী ঐ বিশেষ সমাজের মানুষের বিশ্ব সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার সাথে যুক্ত। রিভার্সের এই উদ্যোগের পর ৩০ ও ৪০ এর দশকে আরো কিছু গবেষণা হয়েছে। ৬০ এর দশকে নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে মেডিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজি দাঁড়ানোর পেছনে এ সকল গবেষণা ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। এই গবেষণাগুলোর একটা সুগভীর গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এর আগে পর্যন্ত ভাবাই হ'ত না যে 'আধুনিক' এবং 'আদিম' ওষুধের মধ্যে কোন প্রকার তুলনা চলতে পারে। ভাবা হ'ত যে সাবেক কালের ওষুধপত্তর হচ্ছে যাদু-ধর্ম ধরনের বিষয়।

সাধারণভাবে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান বলতে বোঝানো হয়ে থাকে স্বাস্থ্য, অসুস্থতা এবং ওষুধের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অধ্যয়ন।

গোড়া থেকেই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক পশ্চিমা ওষুধের একটা গভীর যোগাযোগ ছিলই। তা স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যাই হোক না কেন। ১৯৬০ এবং ৭০-এর দশকে প্রধান বিতর্ক ছিল অ-পশ্চিমাদের চিকিৎসা-জ্ঞান ধর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠান থেকে স্বতন্ত্র কিনা। তবে এই বিতর্ক ছিল মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানীদের। নৃবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ এই স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আসছিলেন। তাঁদের মতে অ-পশ্চিমা সমাজের মানুষজনের চিকিৎসা জ্ঞান যাদু, ধর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠান থেকে একেবারে স্বতন্ত্র বিষয় ছিল এবং আছে। কিন্তু কিছু নৃবিজ্ঞানীর কাছে কতক ধরনের বিষয় বরাবরই আরো আগ্রহের থেকে গেছে। যেমন: জ্বিনে ধরা, আছর পড়া, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি। এর ফলে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত (বা চিকিৎসা) নৃবিজ্ঞানীদের পক্ষে তাঁদের যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে গেছিল। তবে দীর্ঘদিন বিতর্ক

নৃবিজ্ঞানীদের। নৃবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ এই স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আসছিলেন। তাঁদের মতে অ-পশ্চিমা সমাজের মানুষজনের চিকিৎসা জ্ঞান যাদু, ধর্ম এবং আচার-অনুষ্ঠান থেকে একেবারে স্বতন্ত্র বিষয় ছিল এবং আছে। কিন্তু কিছু নৃবিজ্ঞানীর কাছে কতক ধরনের বিষয় বরাবরই আরো আগ্রহের থেকে গেছে। যেমন: জ্বিনে ধরা, আছর পড়া, মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি।

চলতে চলতে নৃবিজ্ঞানের এই শাখায় এখন এটা স্বীকৃত যে, আধুনিক পশ্চিমা ওষুধের ঐতিহ্যেরও নির্দিষ্ট সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আছে। বিজ্ঞানের নামে একে সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করা যাবে না। সে কারণে বর্তমান কালের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান (medical anthropology) আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান (medical science) এবং চিকিৎসা জ্ঞান (medical knowledge) নিয়েও প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের এ সমস্ত বিতর্ক তোলার কারণেই, আপনারা খেয়াল করবেন, 'আধুনিক', 'বিজ্ঞানসম্মত' – এ সমস্ত শব্দের বদলে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বানানো ওষুধপত্তরকে এখন 'জৈব-ওষুধ' (biomedicine) বলা হয়ে থাকে।

গত ত্রিশ বছরে বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেডিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজি শাখাটি দ্রুত এবং ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করেছে। অসুস্থতা সংক্রান্ত নৃবৈজ্ঞানিক আলাপ-আলোচনা আরও সূক্ষ্ম হয়েছে – সেটা স্বাস্থ্য-নৃবিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহ বেড়ে যাবার একটা কারণ। তবে এর পাশাপাশি ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যনীতির পরিকল্পনাকারীদের ভূমিকাও আছে। তাঁরাও সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে ক্রমে ক্রমে আগ্রহ বাড়িয়েছেন।

নামকরণের সংকট

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটা নাম একই সাথে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর সবগুলোই মেডিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজি অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কারণ হতে পারে এই শাখার পরিধির ব্যাপকতা, আবার দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও। যেমন আপনারা ইতোমধ্যেই জেনেছেন 'ঝাড়-ফুঁক', 'জ্বিনে ধরা' ইত্যাদি বিষয়ের উপর কিছু নৃবিজ্ঞানীর বেশি বেশি ঝোঁক আছে। কখনো কখনো দেখা যায়, এরকম বিষয়ের প্রতি আগ্রহের কারণে কোনও নৃবিজ্ঞানী নিজের গবেষণা কাজকে মেডিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজির অন্তর্ভুক্ত না করে অন্য কোন নামে অভিহিত করছেন। এক্ষেত্রে বোঝার সুবিধার্থে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিন্তাকে স্বাস্থ্য-নৃবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হিসেবে দেখা যেতে পারে।

মেডিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজি...: জাতি-ওষুধবিদ্যা (ethnomedicine), ক্লিনিক্যাল নৃবিজ্ঞান (clinical anthropology), ওষুধের নৃবিজ্ঞান (anthropology of medicine), স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান (anthropology of health) ইত্যাদি।

মেডিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজি ছাড়াও বেশ কয়েকটা নাম পাওয়া যায় : জাতি-ওষুধবিদ্যা (ethnomedicine), ক্লিনিক্যাল নৃবিজ্ঞান (clinical anthropology), ওষুধের নৃবিজ্ঞান (anthropology of medicine), স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান (anthropology of health) ইত্যাদি। অনেক লেখক এই সব নামের সাথে শাস্ত্রের মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যেমন, ইউরোপের বাইরের দুনিয়ায় বিভিন্ন জাতির মধ্যকার ওষুধ সংক্রান্ত জ্ঞান অনুসন্ধানকে জাতি-ওষুধবিদ্যা বলবার পক্ষপাতী তাঁরা। স্বাস্থ্য সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানের অন্যান্য গবেষণা এবং ভাবনা-চিন্তাকে তাঁরা আলাদা করে দেখতে চান। তেমনি ক্লিনিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজিকে দেখতে চান এমন এক শাস্ত্র হিসেবে যা ক্লিনিক্যাল কেস-এর, মানে দাওয়াইখানার রোগীর সংকট নিরসনে নৃবৈজ্ঞানিক জ্ঞান কাজে লাগাতে চায়। তাঁদের যুক্তিতে ওষুধের নৃবিজ্ঞান হচ্ছে 'বায়োমেডিসিন'কে আরও কার্যকরী করবার একটা প্রচেষ্টা।

নামকরণের এই সংকট ভাবনা-চিন্তা ও যুক্তির পার্থক্যের কারণে অনেক জটিল হয়ে পড়েছে। আপাতত আপনাদের জন্য সে বিষয়ে আলোচনা বিস্তারিত করা হচ্ছে না। বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে সমস্যাটা বিশেষ আকার ধারণ করেছে। মেডিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজির বাংলা অনেক নৃবিজ্ঞানী ইতোমধ্যেই করে ফেলেছেন 'চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান' হিসেবে। বাংলাতে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান কিংবা স্বাস্থ্যবিদ্যার নৃবিজ্ঞান বললে মেডিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজির আরও সন্নিকট হয়। ক্লিনিক্যাল নৃবিজ্ঞানের বাংলা হিসেবে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান অর্থবহ হতে পারে বলে মনে হয়। যাই হোক, আগের অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা নামগুলোর বাইরেও কিছু কিছু কাজ আছে যাকে একই ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত করে ভাবা হয়। উদাহরণ হিসেবে পরিবেশ নিয়ে কিছু গবেষণা কাজের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আর্সেনিক নিয়ে গবেষণা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তবে এটাও নিশ্চিত হওয়া দরকার, আর্সেনিক বিষয়ক

গবেষণাতে একেবারে বিরুদ্ধ দুইটি পক্ষ আছে। একটি পক্ষ স্পষ্ট করে দায়ী করছে অপরিকল্পিত নলকূপ বসানোকে। অন্যপক্ষ তা করছে না। এই উদাহরণ দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণা ও অধ্যয়নের মধ্যে যে বিতর্ক চলে সে বিষয়ে মনোযোগে রাখা।

স্বাস্থ্য-জ্ঞান ও নীতিমালাতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ

এখানে অত্যন্ত সংক্ষেপে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ একটা পরিচয় করিয়ে দেব। এর লক্ষ্য হচ্ছে: ফলিত নৃবিজ্ঞানকে শক্ত ভিত্তি দান করাবার কাজে যাতে আপনারা ভাবনা-চিন্তা করবার ক্ষেত্র পান। আপনারা এরই মধ্যে জেনেছেন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। এই পরিধিতে বহু ধরনের প্রসঙ্গ এসেছে – আধুনিক চিকিৎসা জ্ঞান, পশ্চিমা ওষুধ থেকে শুরু করে শিল্পবিহীন সমাজের স্বাস্থ্য জ্ঞান এবং ওষুধ অবধি। কিছু কিছু নৃবিজ্ঞানী এই ব্যাপকতার মধ্যে কিছু জরুরী প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পশ্চিমা আধুনিক জ্ঞানকে অনেক স্বাস্থ্য-সংকটের জন্য দায়ী মনে করছেন। কেউ কেউ আবার ওষুধ বানানোর কারখানা বা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির আধিপত্যকেও শনাক্ত করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় অনেক নৃবিজ্ঞানী অ-পশ্চিমের সমাজ থেকে কল্যাণকর চিকিৎসা বিদ্যা সামনে নিয়ে আসছেন। সেগুলো সম্ভব হচ্ছে চিন্তাশীল ও প্রশ্নমনস্ক ফলিত নৃবিজ্ঞানের চর্চা থেকে।

দার্শনিক মিশেল ফুকোর একটা গ্রন্থে পশ্চিমা চিকিৎসা জ্ঞানকে জোরালো ভাবে প্রশ্ন করা হয়েছে, নানান শক্তিশালী যুক্তি দিয়ে সমালোচনা করা হয়েছে। এরপর অনেক নৃবিজ্ঞানী বা অন্যান্য শাস্ত্রের গবেষক সেই যুক্তিকে আশ্রয় করেছেন। আপনারা জেনেছেন প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়ে থাকে। সেসব গবেষণার পেছনে প্রধানত জনসংখ্যা বিষয়ক দুর্ভাবনা কাজ করে – এটা এখন অনেকেই যুক্তি দিচ্ছেন। আধুনিক প্রজনন চিকিৎসা কিভাবে নারীর স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে সেটা নিয়েও নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজ হচ্ছে। এরকম ধরনের কাজ ও তৎপরতা নৃবিজ্ঞানের সম্ভাবনাকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তুলছে।

সারাংশ

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রেক্ষাপট হচ্ছে উন্নয়ন ভাবনার বিকাশ এবং গরিব বিশ্বের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ এই ভাবনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া। এই প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান ফলিত নৃবিজ্ঞানের একটা শাখা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। বাংলায় কেউ কেউ একে চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান বলেছেন। এর পরিধি ব্যাপক এবং এর বিষয় বহুবিধ। প্রধানত কয়েকটা শিরোনামে নৃবিজ্ঞানের অধ্যয়নে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে ভাবনা ধরা পড়ে: জাতি-ওষুধবিদ্যা, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান, ক্লিনিক্যাল নৃবিজ্ঞান, ওষুধের নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি। এই শাখার ভিতরে নানাবিধ বিতর্ক বিদ্যমান। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে: পশ্চিমা চিকিৎসা জ্ঞান চূড়ান্ত কিছু কিনা। সেই সূত্রে পশ্চিমা আধুনিক চিকিৎসা জ্ঞান নিয়ে এই শাখা ব্যাপক অনুসন্ধানী অধ্যয়ন চালাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন -

১। সিয়াটো (SEATO) কী ?

ক. সাংস্কৃতিক জোট
খ. অর্থনৈতিক জোট
গ. সামাজিক উন্নয়ন জোট
ঘ. সামরিক জোট

২। নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে মেডিক্যাল এ্যান্থ্রোপলজি কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ৫০-এর দশকে
খ. ৬০-এর দশকে
গ. ৭০-এর দশকে
ঘ. ৮০-এর দশকে

৩। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান বলতে বোঝানো হয়ে থাকে---------- ।

ক. স্বাস্থ্য অধ্যায়ন
খ. অসুস্থতা অধ্যায়ন
গ. ঔষধের সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অধ্যায়ন
ঘ. উপরের সবগুলোই

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞান কী?

২। জনস্বাস্থ্য বলতে কী বোঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণের জটিলতা আসলে এর বিরাট পরিধিকে নির্দেশ করে – ব্যাখ্যা করুন।

২। এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য প্রশ্নে নৃবিজ্ঞানীরা কী ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে বলে আপনি মনে করেন?